প্রকাশক : শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
সীমান্ত
৬সি রাজকুমার চক্রবর্তী সরণী, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ : অতনু বসু

মুদ্রক : শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪)

মন্বন্তর শেষে ৯

অরুণ মিত্র (১৯০৯)

শর্টকাটের খবর ৯

বিরাম মুখোপাধ্যায় (১৯১৪)

কাঠটগরের শাদা ১০

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৭)

মুক্তি ১১

মণীন্দ্র রায় (১৯১৯)

চতুর্দশী ১২

চিত্ত ঘোষ (১৯২০)

আশ্বিনের ঘুড়ি ১৩

গোলাম কুদ্দূস (১৯২০)

কী যেন নেই কী যেন আছে ১৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০)

সপ্তাহ প্রতিদিনই ১৪

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২১)

জালিয়ানওয়ালা ফের ১৫

শ্রাম বসু (১৯২৫)

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে ১৭

কৃষ্ণ ধর (১৯২৬)

জয় হে মানুষ, জয় হে ১৯

বিতোষ আচার্য (১৯২৬)

দুর্লভ ২০

সিদ্ধেশ্বর সেন (১৯২৬)

পাথের কুড়োয় ছন্ন মূর্তি ২১

মৃগাঙ্ক রায় (১৯২৭)

আমার বাড়ি ২২

গোবিন্দ ভট্টাচার্য (১৯৩০)
নিষ্পত্র খোয়াই ২৩
মিহির ঘোষদস্তিদার (১৯৩১)
আমাকে ক্ষমা করো ২৪
অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩২)
গাইড ২৬
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (১৯৩২)
ঘুম, স্বাধীনতা ২৬
তরুণ সান্যাল (১৯৩২)
পাহাড়ের ঘাড়ে একাকী ২৮
বীরেন্দ্রনাথ সরকার (১৯৩২)
দুঃখের মহত্ত্ব ২৮
শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২)
অন্ধবিলাপ ২৯
সুনীলকুমার নন্দী (১৯৩২)
দুঃখের শরিক ৩২
সুনীল হাজরা (১৯৩২)
স্বপ্নের কেতন ৩৩
মণীন্দ্র ঘটক (১৯৩৩)
হবি তো হ ৩৪
তুচ্ছের বিনিময়ে ৩৪
শ্যামসুন্দর দে (১৯৩৩)
মিনার ৩৫
রবীন সুর (১৯৩৪)
দীক্ষা নিতে হবে ৩৬
বাদল ভট্টাচার্য (১৯৩৪)
আমার হৃদয় জুড়ে ৩৭
শিবশম্ভু পাল (১৯৩৪)
দুর্গেশনন্দিনী ৩৮
অমিতাভ দাশগুপ্ত (১৯৩৫)
কর্ণ ৩৮

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫)

প্রত্যাবর্তন ৩৯

রত্নেশ্বর হাজরা (১৯৩৬)

তবে ৪০

দীপেন রায় (১৯৩৭)

১৩৯৩ ৪১

নীরেন্দু হাজরা (১৯৩৭)

এক গেলাস তৃষ্ণা ৪২

সন্তোষ চক্রবর্তী (১৯৩৭)

শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না ৪৩

কমলেশ সেন (১৯৩৮)

আমি জানি না ৪৪

প্রদোষ দত্ত (১৯৩৮)

একদিন সেইদিন ৫২

মণিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৩৮)

২৫শে বৈশাখ ১৩৯৩ ৪৪

শুভাশিস গোস্বামী (১৯৩৮)

শীতের সাপের মতো ৪৬

আনন্দ ঘোষ হাজরা (১৯৩৯)

গতানুগতিক ৪৬

শিবেন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯)

পাগলাঝোরার গতিপথে ৪৭

উত্থানপদ বিজলী (১৯৪০)

দুঃখ নয় দুঃখ নয় ৪৮

পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০)

স্বপ্নচারণার ভূমি ৪৮

শিশির সামন্ত (১৯৪০)

অসংগতি ৪৬

অজিত বসু (১৯৪১)

ভূত ও ভবিষ্যৎ ৫০

অমিয় ধর (১৯৪১)
কালের সন্ধ্যাই সমাগত ৫১
মুকুল গুহ (১৯৪১)
আমাদের জীবন যাপন ৫২
অলককুমার চৌধুরী (১৯৪৪)
এখনো সময় আছে ৫৩
কালীকৃষ্ণ গুহ (১৯৪৪)
বসন্তের হাওয়া ৫৪
শুভ বসু (১৯৪৬)
প্লাবন জোকার ৫৫
অমিতাভ গুপ্ত (১৯৪৭)
খনন পর্ব ৫৫
অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭)
একসাথে ৫৬
মনোজ নন্দী (১৯৪৭)
যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে ৫৭
অজয় নাগ (১৯৪৮)
এসো পোশাক ৫৭
অরবিন্দ পাল (১৯৫০)
অরণ্যে জীবন ৫৮
শম্ভু বসু (১৯৫২)
ফ্যাকাশে ধান গাছের মতো ৫৯
জয় গোস্বামী (১৯৫৪)
রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে ৫৯
মৃদুল দাশগুপ্ত (১৯৫৫)
রান্নাঘর ৬০
অতনু বসু (১৯৫৭)
প্রেমাংশুর লাশ ৬০
পরিচয় বসু (১৯৫৮)
কবি প্রসবিনী মাতা ৬১
মলয় পাত্র (১৯৫৯)
বন্যা ৬৩

আমাদের কথা

এই সংকলনটি সীমান্ত-এর কবি-বন্ধুদের দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত। এটি একটি অব্যবসায়িক যৌথ প্রকাশনার প্রয়াস মাত্র। বাঙলা কবিতার বৃহত্তর সেই বাতায়নটি আজ খণ্ডিত। যেখানে দাঁড়ালে সমস্ত আকাশটা এক ঝলকে চোখের সামনে জেগে উঠতো। দশকের তন্তুজাল আর গোষ্ঠিগত আস্ফালনে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা আজ বাঙলা কবিতার বাতায়নটিকে দীর্ণ করে তুলেছে। এই পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা এই প্রকাশনায় হাত দিয়েছি। আর বেছে নিয়েছি এই বছরের শারদ সংকলনগুলির প্রকাশ কালকে। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়েছে কবি শুধু সময় নিয়ে কবিতা লেখেন না সময়ও সুযোগ মতো বাধ্য করে তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে। অর্থাৎ কালের উদ্দেশ্যও প্রতিফলিত হয়ে যায় কবিতার মধ্যে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কবিতাগুলি সংকলিত করার চেষ্টা করেছি মাত্র। আশা করবো এর সার্থকতা বা ব্যর্থতা যোগ্য পাঠকের দ্বারা নির্ধারিত হোক।

কবিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে খুব বেশি যে নিরপেক্ষতার মুখচ্ছদটি আমাদের আঁটতে হয়েছে তা নয়। মূলত সেই সব সুপরিচিত কবির কবিতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা পছন্দের কাজটি সমাধা করেছি—যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কবিতাকে মৌল তাৎপর্যে সর্বজনীন করে তুলছেন। এবং দীর্ঘকাল বিকাশশীল সংস্কৃতি নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাঙলা কবিতার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র রূপায়ণে সার্থক করে তুলছেন কবিতার বাস্তবতা। কিছু পরিচিত কবি আমাদের এই সংকলনে অনুপস্থিত থেকে গেলেন এই কারণে যে এটি একটি বিশেষ এক মুহূর্তের প্রকাশনা কালকে রূপায়িত করা হলো বলে। এখানে আমরা সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার সামগ্রিক রূপটি বৃহত্তর পাঠক-সাধারণের কাছে তুলে ধরার কোনো চেষ্টাও করিনি। শুধু একটা কথা, যেটা আমাদের বিশ্বাসের গোড়ার কথাও বটে।—আমরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে বিশ্বাসী নই। কবিতায় তো নয়। আর যেখানে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট হোক না কেন, কবিতায় হয় না। তরুণ কবিদের ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে তাঁদের ক্রম পরিণতির ঝোঁকের ওপর। এ অনুমান ভবিষ্যতে ভুল প্রমাণিত হতেও পারে। ক্ষতি নেই। তবু তাঁদের অগ্রগমনের একটা ঝোঁক অন্তত এখানে ধরা রইল ভবিষ্যতের হাতে।

অধিকাংশ কবিতা 'লিটল ম্যাগাজিন' সম্পাদক নামক দধীচিদের দ্বারা প্রকাশিত শারদ সংকলনগুলি থেকে সংগৃহীত। সীমান্ত-এর কবি-বন্ধুদের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রেসের কর্মী-বন্ধুদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

দীপেন রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মন্বন্তর শেষে

জানি না এ মন্বন্তর
শেষ হবে কিনা,
মহা প্রলয়ের এক মহা বিস্ফোরণে।
'সেনটরাস' না কি কোনো
আরো দূর প্রহেলিকা 'গ্যালাক্সি'-র
নাভি-মূল থেকে
অমা গাঢ় গুপ্ত রন্ধ্র এক
অনিবার্য আকর্ষণে
ত্রিভুবন শোষণের পর
আবার তা করবে উদ্গিরিত ?

সে ধ্বংস লীলার পর
এ সপ্তম মনু কাল শেষে
এ সৃষ্টি কি হবে আর
প্রাণে কল্লোলিত !

হয় যদি
তবু সেই নতুন সৃষ্টিতে
মানুষের মত কোনো
অসহায় প্রাণের প্রতিভূ
অকারণে, শুধু ক'টি শব্দ গেঁথে
নিরর্থক ছন্দিত ঝঙ্কারে
হবে কি কৃতার্থ ?

অরুণ মিত্র

শর্টকাটের খবর

নয়া শড়কে মেঘ জমছে, কান্নাও ভেসে আসছে ৷৷
—কেন, কান্না কেন ? সিধে রাস্তায় কেউ কাঁদে
কখনো শুনিনি।

—তা বলেছেন ঠিক। শোনাটা বড় রহস্যময়
ক্রিয়া। লতি নড়ে পাতি নড়ে তারপর চুপচাপ, ওই
মিলিয়ে গেল ঢেউ। মোট কথা একটু অপেক্ষা করলেই
আর শুনতে পাওয়া যায় না। যাবতীয় শর্টকাটে
এমন হয়।

—কেন, অপেক্ষা করার কথা কেন?
—সেটা এক হিসেবছুট সময়। সইয়ে
নেওয়ার জন্যে লাগে! শেষ পর্যন্ত দেখবেন
হাসিহাসি মুখ স্বর্গের সিঁড়ি ঘেঁষে, যেখান
থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেলে সুখশান্তির
ঘর। তার আগেই অবিশ্যি কান্নাটান্না ধুয়ে
সাফ। মেঘ জমছে, জমতে দিন।

বিরাম মুখোপাধ্যায়

কাঠটগরের শাদা

না-পূর্ণ না-শূন্য বীততৃষ্ণ নই নই
মাঝারির মাপে খুশি, মনীষার প্রাজ্ঞ বিশেষণে
স্তুতি-স্তাবকতা কালো শজারুর কাঁটা
অনুপল অন্বেষক বিবেককে জর্জর বিঁধছে,—
অপূর্ণের ঘটের পল্লব ও শান্তি শুদ্ধি সিদ্ধি
নয়-কোনো সহৃদয় শুদ্ধোদন-সহযাত্রী হবো
শাকান্নে নুনের ছিটে উপার্জিত নিজস্ব স্বাদুতা
অবনমনীয়তার পাল্টা পোক্ত দেবদারু-মেরু,
খ্যাতির কাঙালপনা কাঁড়িকাঁড়ি দৌলতলালসা
মুক্ত হলে প্রাপ্তি ছিদ্রহীন প্রেয়তম উত্তরণ,—
বিপরীতে ইড়া ও পিঙ্গলা আর স্নায়ুর পীড়নে
প্রতিষেধ আছে—ব্রহ্মসূত্র কিংবা কঠোপনিষদ

কৃটকচালের কণ্টকিত দ্বান্দ্বিক সংকটশূন্য
ধূলো-ময়লা-ছাই ঝেড়ে মুছে
গঙ্গোত্রীর গোত্রহীন প্রশাখার খাড়ি-মোহনায়
শান্ত স্বচ্ছ টলটল নদীর আয়না-না ঈর্ষা না—
পুণ্যস্নানে অপার্থিব রুচিরার লেশকণা নেই—
সিঁদুরে মেঘের ভয়ে গেরুয়ার মন্ত্র-নামাবলী
আদুল এ-গায়ে জড়াবো না।   সিদ্ধি ঋদ্ধি জলাঞ্জলি।

কিছু উঁচকপালে ও রঁ্যাদাঘসা উটকো ধনীর
শখশিল্প ঝুল্-বারান্দার টেরাকোটা টবে-টবে
টকটকে ব্লাকপ্রিন্স দেদার ফুটছে,—ফুটুক না—
আমার এ-আঙিনার না-পছন্দ্ নিভৃতির কোণে
কাঠটগরের গুচ্ছ শুভ্রতার নম্র প্রতিনিধি॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মুক্তি

ডাকে পাঠানো তোমার কবিতাটি পেয়েছিলাম।
অনুরোধ ছিল যদি কোথাও ছাপা হয়।

বয়সে তরুণ, হাতের লেখা উজ্জ্বল, যত্নে দীপ্তিতে
টলমল করছে অক্ষরগুলি।

অনুমান করতে পারি কী ভাবে লেখা হয়েছিল এই কবিতা।
একটি সুন্দর চিত্রকল্প বা একটি উজ্জ্বল পংক্তি
উপহার দেবার জন্যে নয়।

এই কবিতা লেখার সময় তুমি আক্রান্ত হয়েছিলে,
কেউ আলোড়ন তুলেছিল তোমার রক্ত চলাচলে,
গভীর রাত পর্যন্ত তুমি জেগেছিলে।
এই কবিতায় তোমার হৃদপিণ্ডের যন্ত্রণার আভাস,
ভালোবাসার উচ্চারণ আর বিচ্ছেদের সকরুণ আর্তি।

যেন তুমি নিজেকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তৈরি করেছিলে
সকালের লাল গোলাপ।
তোমার এই কবিতা ছাপা না হলে
কী এসে যায় পৃথিবীর ?
অথচ এই কবিতাটির দরকার ছিল। কেননা এই
কবিতা লিখেই
তুমি নতুন মানুষ হয়ে উঠেছ। এই কবিতাই
অনেক দিনের যন্ত্রণা গোঙানী আর বিরহের পর
তোমাকে দিয়েছে মুক্তি ॥

মণীন্দ্র রায়

চতুর্দশী

তোমার সমীপে যেতে নষ্ট হল সমস্ত জীবন
পাশপোর্টহীন একা অনাগরিকের বহিষ্কারে ;
শূন্যের ঘণ্টার আজো প্রতিধ্বনি প্রহত এমন
তোমারই আশ্রয় খোঁজে অনিদ্রার রাত্রির কান্তারে।
কী জানি কী অপরাধে অর্ধপথে ধ্বসে গেল সেতু,
নিশ্চিত কক্ষের বাইরে আঁকি ব্যর্থ দীর্ঘ প্যারাবোলা,
নেই তিথি, ঋতু, স্মৃতি, এ অস্তিত্ব যেন বা অহেতু,
সঙ্গীহীন অন্ধকারে ব্রাত্য এই দগ্ধ অগ্নিগোলা।

অথচ কতো-যে গেল সামান্য এ সঞ্চয়ে আমার
যতো তার তাম্রমুদ্রা অশ্রু ততো, অন্ন-কান্না মিশে
এমন আহুতি, এই রক্তের মথিত অন্তঃসার
কালের পঙ্গুর গ্রাসে লুপ্ত হয়ে ঝরছে পুরীষে।
নগরীর বাইরে আজো বসে আছি, হৃদয়ভিখারী,
ঢালো ওষ্ঠে সুধা, প্রেম, কিংবা খোলো অগ্নি-তরবারী।

চিত্ত ঘোষ

আশ্বিনের ঘুড়ি

রঙ-চটা এই ছবির
মুখগুলো কি বলে—
একটা মোম নেবে
আরেকটা মোম জ্বলে।

আকাশ কুসুম আছে
আছে মোমের দড়ি
কানের খুব কাছে
কি কথা বলে ঘড়ি।

গভীর জল, নীচে
রূপোর সাদা বালি
অন্ধকারে কে
দিচ্ছে করতালি।

মেঘের মুখ কালো
সাপের মতো ঝুরি
যেন আকাশ খোঁজে
আশ্বিনের ঘুড়ি।

গোলাম কুদ্দুস

কী যেন নেই কী যেন আছে

ছিল, কিন্তু পুড়ে গেল।
ছুরি বসিয়ে উড়ে গেল।
ভাইকে ভাই দিল না ঠাঁই।
মাকে করল দূর ছাই।
নানা রঙা পাতাবাহার
টাকাবাহার যাঁতার আহার।

শূন্য মাঠে নারীপ্রায়
যা ছিল না গজিয়ে উঠল—
অচেনারা চেনাশোনার
ঢেউ তুলল,
একসঙ্গে কত লড়ল, কত মরল,
থাকা না-থাকার মাঝে দাঁড়িয়ে
যা নেই তার স্বপ্ন দেখল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সপ্তাহ প্রতিদিনই

শিব নেই। ছি! ছি!

সেই দুঃখে
দক্ষযজ্ঞে
যাননি দধীচি।

বৃত্রাসুর হানা দিলে
স্বর্গচ্যুত
হল দেবতারা—
খোদ ইন্দ্র রণে ভঙ্গ দেন।

তখন দধীচি ছাড়া
দেবগণ
অনন্য উপায়।

দধীচি দিলেন প্রাণ।
তবে দেবতারা পায়
তাঁর অস্থি থেকে
বৃত্র নিধনের বজ্র—

যাঁর জন্ম
একদা শান্তির গর্ভে
অথর্ব মুনির ঔরসে
এবং প্রেতের গর্বে
সারস্বত পুত্রের পিতা যিনি।
বিনা নামে বিনা অর্থে
বিনা যশে
সে বজ্র বানিয়ে যায়
নিজের অস্থিতে

নেপথ্যে

সপ্তাহ

প্রতিদিনই

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

জালিয়ানওয়ালা ফের

মৃত্যুর মুখাগ্নি সেরে ফেরে ইতিহাস
ইতিহাস আমাদের শ্মশানচণ্ডাল!
নিজেকেই ঘুরে-ঘুরে জন্মজন্ম ও মুর্দাফরাশ
ফিরে আসে চিতা থেকে চিতার আগুনে হাত সেঁকে
হরিধ্বনি থেকে হরিধ্বনি মেখে ডোমকাক
শামুকের গতি আসে, ইতিহাস হাঁটে।
সামনেও না পেছনে না—অগ্র কি পশ্চাদ্‌গতি নয়
ঝুমঝুমি-সাপের হাঁটা সরে পাশে-পাশে—
ইতিহাস হাঁটে আর মড়ক পায়ের তালে ঝুমঝুমি বাজায়:
হচ্ছে-হচ্ছে হবে, রোসো, ধীরে সুস্থে হবে!

জালিয়ানওয়ালাবাগ হাঁটে জালিয়ানওয়ালাবাগ!

সংবিধান সংসদ কি গণতন্ত্র সবই
দিব্যি সুখস্বপ্ন ঠাণ্ডা ঘর—
দিব্যি সুখস্বপ্নে মস্ত্ ওমরাহ্-জায়গিরদার-মুত্সুদ্দির দিন।
গণ-স্পর্শছাড় গণতন্ত্রে মিলবে সবই
হচ্ছে-হচ্ছে হবে, রোসো, ধীরেসুস্থে সব-ই!
আপাতত তন্ত্র সার, যোগিনীচক্রের তান্ত্রিকেরা
ইতিহাসরঙ্গিণীকে খায় কোল, চিরঅমাবস্যা-সিদ্ধি চায়।

মানুষের বুকে পা তাতা-থৈ উলঙ্গিনী ধর্ম খাঁড়াধরা
সম্পত্তিপিশাচ পুরোহিতসাজে জাতপাত-নামাবলি নেয়—
হতে-হতে-হচ্ছে না, হচ্ছে না? হবে অবশ্যই হবে।

বেল্‌চি হয়ে আর্‌ওয়াল কে যায়, কে যায়?
যায় জালিয়ানওয়ালাবাগ।

হচ্ছে-হচ্ছে হবে, রোসো, ধীরেসুস্থে সব-ই:
হাভাতের মুখে অন্ন, অনিদ্রার চোখে ভাতঘুম
দুশ্চিন্তা মাথায় পাবে নির্ভয়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়
দারিদ্র্য দেশছাড়া হবে,—দূর্‌দূর্, দু-গালে চুনকালি।
কিন্তু আগে চাই মুক্ত বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বসত্
বাক্‌স্বাধীনতা—স্রেফ সত্যিমিথ্যে নয়ছয় ম্যাজিক
ভোটপত্র বাঁধা বাক্সে, ভূমিদাস দাসত্বে জোয়ালে
ঠ্যাঙাড়ে সেনারা চরবে গঞ্জেগাঁয়ে গণতন্ত্রত্রাণে
আর চলবে লাঠি গুলি ভূপালের গ্যাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে।
—কেমন, হচ্ছে তো, নাকি হচ্ছে না? আহ্, ধীরে সুস্থে হবে
আর্‌ওয়াল ও কান্‌সারা-য় মুখ দেখায় অবিকল
জালিয়ানওয়ালা ফের!

রাম বসু

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

আলো আর অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
মাঝে মাঝে মনে হয় অনায়ত্ত রহস্য হয়ে গেছে
অথবা উত্তুঙ্গ হাওয়ার উদোম উল্লাসে
মহাকাশ থেকে পাঁজর অবধি দীর্ঘ ছায়াপথ
সেখানে এমন কিছু রয়ে গেছে যা অনায়ত্ত
তাঁকে কোনদিন জানবো না

গতরাতে বড় সড় ধরনের এ্যাকসান হয়ে গেল
এল এম জি চলেছে, লাশ তো নেমেছে গোটা তিনেক
ভোরবেলা ক্লাবের রকে একটু গড়িয়ে কাক-ভোরে উঠতেই
এই কথা মনে হল তার
পাইপগানের নলে আদরের হাত বোলাতে বোলাতে মনে হল
প্রতি মুহূর্তেই নতুন করে ভারসাম্য পেতে হয়
না হলে এই সৌরবৃত্তের সঙ্গে তাকেও মিলিয়ে যেতে হবে
অন্তহীনতায়, অন্তহীন শূন্যতায়

অথচ কোথায় সেই ভারসাম্য ?
লাট্টুর মতো ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ঘুরে
বৃত্তাকারে, পৌনপুনিকতায়,—জীর্ণ, ক্ষয়ে-যাওয়া
কখনো বেহালার কোমল আলাপে
দেওয়ালগুলো উড়ন্ত পাখির ডানা
কার্নিসে জানালায় রাতকানা দীর্ঘশ্বাস, আর বহুদূরে
জলপ্রপাত, ফসলের মর্মর, কৃষ্ণরেণু-অন্ধকার
তখন, নিজেরই অজ্ঞাতে, চোখের কোণে জলের ঝিকমিক

কোথাও যদি কোন অদৃশ্য গুপ্ত দরজা থাকতো
যার ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গের পরে সুড়ঙ্গ পার হয়ে
পার হয়ে গগন-ঠাকুরের ছবির মত রহস্য সোপান

সহসা প্রদীপের মায়াবী আলোয় উদ্ভাসিত আদি মা ম্যাডোনা
অথবা গীর্জার অর্গানে অবরোধ ভাঙা অশ্রুর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ
হাড়ে মজ্জায় ঘুণ ধরা অন্ধকারের নীচে আলোর বাঁকানো তলোয়ার
আর নিষ্কলঙ্ক আকাশের অঙ্গরাগে উষার গালের অস্ফুট ডালিম
তা হলে ভয়ঙ্কর অবরোধে চাপা পড়তো না সে
হয়তো বৈদূর্যমণি স্থান আর কাল হতো তার পরিমাপ
সে-ও হতে পারতো সুষমায় সূর্যের সম্বিৎ

ভোর না হতে নামহীন অস্তিত্বের ছোবলে ছোবলে নীল
সে যখন মাথার যন্ত্রণা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালো
তখন চোখদুটো জবা, রগের শিরা পাকানো-দড়ি
তখন থুত্থুড়ে ট্রাম ঘণ্টা দুলিয়ে নেমে পড়েছে রাস্তায়
তার মনে হল সূর্য বুঝি গ্রহনক্ষত্রের ভিড়ে পথ হাতড়ে অবসন্ন
আর সংখ্যাতীত পোকামাকড়ের ধারালো দাঁত গাছের শিকড়ে বাকলে
তাকেও এই সব নিয়েই ভারসাম্য খুঁজে পেতে হবে নীল শূন্যতায়
সার্কাসের ওস্তাদ ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের মতো

অথচ মুক্তি কিছুতেই নেই, আনন্দ নেই, রোমাঞ্চ নেই কিছুতেই
অদৃশ্য অথচ জল্লাদ-কঠিন নিগড়ে পা দুটো আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা
আলোহীন তাপহীন শীতল মৃত্যুর আয়োজন পরিসর শুধু ধ্বনিত
শুধু শব ঢাকা চাদরের মতো সেও উড়ন্ত দিকচিহ্নহীন তৈমুর হাওয়ায় হুঙ্কারে
আর সে এক শূন্য থেকে অন্য শূন্যে নৈঋতে, ক্রম বিলুপ্ত কালো বিন্দু

অবশ্যই ভীষণ ভয় লাগছিল তখন
অনিশ্চিত আতঙ্ক বুকের নিরাকার গুহায় অবরুদ্ধ উন্মাদ ঘুর্ণি
টালমাটাল নৌকো, ফুটি-ফাটা ঠোঁট, বমি-বমি ভাব
মনে হল তার হাত পা নাক মুখ চোখ
নক্ষত্র বলয়ের কুহেলি জটলায় যদি হতো তন্দ্রাচ্ছন্ন মগ্ন আলাপ
হয়তো তার আহত গৌরব হতো অপরিমেয়তা, সমুদ্র শঙ্খের ঘোষণা
বিস্তারের বিপুলতায় তার চৈতন্যের সীমা হতো মহাজগতের দিক্‌চক্রবাল

তা আর কিছুতেই হল না
সে বৃথাই হাত বোলালো পাইপগানের নলের ওপরে
সহসা মনে হল গ্রহ নক্ষত্র ছিটকে এসে ঢুকে পড়ছে তার ভেতর
অন্তরীক্ষের অন্ধকার বলয় থেকে চাপ-চাপ ভয়াবহ নিকষ তামস
তার সত্তার ওপর সজোরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মরণপণ বম্বারের মতো
সেখানে জীবনের কোন স্পন্দন নেই, মৃত্যুর শীতলতাও নেই
সূর্যহীন সময়ে দীর্ঘ প্রস্তাবনা ভূমিতলের অবসন্ন পাণ্ডুরতায়
আর সে ক্রমাগত হয়ে যাচ্ছে পাতাল থেকে পাতালের তলায় নিশ্চল বোবা
হিমবাহ

অসহায় অনুচ্চার আর্তনাদ তার গলায় ডেলার মত পাকিয়ে
আর পরিচিত পৃথিবী, তার অস্তিত্ব, খালে ভাসা বাসি মড়ার মুখ
ফ্যাকাশে-ফ্যাকাশে চাঁদের মত নির্জনতা, সে ভেসেই চলেছে, ভেসেই চলেছে

নিরালম্ব শূন্যতা, পায়ের নীচে হাঁ-করা ভৌতিক শূন্যতা
সে আর কিছু ভাবতে না পেরে পাইপগান ঠেকালো তার রগে
তার রগে রক্তাক্ত গহ্বর, অনাদি কালের তৃপ্তিহীন ক্ষুধার্ত গহ্বর

থুত্থুড়ে ট্রাম গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে ভোর বেলাই হাঁপাচ্ছে।

কৃষ্ণ ধর

জয় হে মানুষ, জয় হে

প্রাক্তনের কাছে কিছু সুরভিত শব্দ ও চেতনা
প্রতিদিন খুঁজে নিতে চাই, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
আমারও প্রাক্তন ছিল, আজকের সময়ের ব্যবহার থেকে
ভিন্নতর চর্চা নিয়ে তারা আজ অতীতে শায়িত।

এখন ক্ষুধার্ত হলে সেই সব সময়ের কুলুঙ্গি থেকে
পদাবলী চর্যার সুনিশ্চয় আস্বাদ ফিরে পাই
তাতেই সন্তোষ, তাতে হাজার বছর কালের
অবিনশ্বরতা প্রতিভাত হয়ে আছে।

মানুষের সময়ের সমাজের রৌদ্রকণা খুঁটে খুঁটে
তুলে নিই, এভাবেই পার হই হৃদয়ের সাঁকো
সময়ের নদী ও সমুদ্র

প্রাক্তনের কাছে আমি ঋণী আমার ভাষা ও ভাবনা
আমার মগজ ঘুরেফিরে সেদিকেই সমর্পিত
এক পা এগিয়ে দু পা পেছোই সাবধানে পার হতে
দুর্গম কান্তার গিরি, মরুস্থলী, শব্দের সাগর।

যদিও অপূর্ণ থাকে সন্ততির দুধ ও ভাতের স্বপ্ন
আলতা পায়ে অন্নপূর্ণা চলে যান মজুমদার বাড়ি
জানেন একথা শুধু রায়গুণাকর

প্রাক্তনের কাছে সেই সব ঋণ শোধ দিতে
প্রতিদিন কলম শানাই, শব্দ খুঁজি
ছন্দের সোপান বেয়ে যাই পদাবলী উপত্যকায়
বলি, জয় হে কবিতা, জয় হে সময়কাল,
প্রাক্তন ও বর্তমান জয় হে মানুষ, জয় হে।

বিতোষ আচার্য

দুর্লভ

কলকাতা, কুলটা তুই! সাবেকী সে বদরক্ত, স্বেদ
আজো তোর শরীরে, শিরায়
—নেচে যাস যেন বা হস্তিনী
প্রস্বেদে ভাসাস্, কিন্তু সেই পুলক, কাঁপন?
আজ স্মৃতি…
পিপাসায় ছাতি ফেটে গেলে
আজো দেখি
জলপাত্রে গিজগিজ পোকারা সমানে উজায়

—ভাদ্রের গুমোট নেড়ে ক্বচিৎ কখনো
প্রসাধন-পটু নাগরী-গোড়মুড়া যেই
ঢেউ তুলে হাঁটে
হায় হায়, কী যে মস্ত দাপাদাপি বুকে
টায়ারের ছাপ-মারা আরেক সড়ক এসে
নিয়ে যায় পেট্রলের ঝড়ে

সব জানি
—যতই কুলটা হোস, তুই তো জানি কারো কারো
বুকের পাঁজর নিংড়ে, দুধ টেনে
অবোধ শিশুর মতো অশক্ত শরীরে
কী স্বস্তিতে তোরই কোলে তারা যে ঘুমায়
মরি মরি, এই সমাহার
দুর্লভ, দুর্লভ ॥

সিদ্ধেশ্বর সেন

পাথের কুড়োয় ছন্নমূর্তি

নেই কোনোখানে পা ফেলারও, তবু
প্রকৃতিস্থের ছন্দ,
কোথায় দুঃস্থ পা

ফেলেছি,
নেই কোনোখানে—
পা-ফেলারও গতি, স্পন্দ !

ত্বরণ হয়তো !
আলোর চলার, বাঁকারও গতিতে
গতির ভেদে

বেঁকে-চুরে চলা ? এই-ই কী
স্মরণ—
আপেক্ষিকের শর্তে?

নগর,
বাড়াবে অসুন্দরের
রীতি—

একটি সবুজ কলি জাগাবে না, মেনে-ও
স্তুতি !

ভেঙে—
অজস্র পাথর, খোয়ায় শুইয়ে
পাঁজর

পাথেয় কুড়োতে পথেই নেমেছে
লিঅর
ছন্নমূর্তি !!

মৃগাঙ্ক রায়

আমার বাড়ি

কেউ নেই, এঘর ওঘর ঘুরে ছাখো,
বাগান বা বারান্দা ঘুরে ছাখো
—কেউ নেই। কুলুঙ্গিতে সিঁদুরের দাগ আছে,
দেয়ালে হরিণের মাথা, আছে পেতলের পঞ্চপ্রদীপ,
ভাঙা বাক্স, কাঠের খড়ম, পাথরের কলমদানী,
চোখ-আঁকা সিঁদুর-মাখান রামদা। তাছাড়া
দক্ষিণে গাছ ঘেরা মস্ত পুকুর, দুপুর হলে
কলসিতে জল ভরার আওয়াজ,
মাঠের আকাশে ধূ ধূ করছে
তীরের ফলার মত একটা ছুটো পাখী।

কেউ নেই, অথচ কেউ কেউ ছিল।
সন্ধ্যা হলে গোয়ালে গরুর গম্ভীর কাশি
শোনা যেত, শিশুগাছের মগডালে
জ্বল জ্বল করত লক্ষ্মীপ্যাঁচার চোখ ;
কিছু মানুষ সারাদিন বসে বসে
প্রাচীন গল্পের ছাঁচে
সাদা কালো মানুষ বানাত।
আজ কেউ নেই, দূরে কাছে কেউ নেই—
সাপের মুখে ব্যাঙের আর্তনাদের মত
শুধু আমি আছি ॥

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

নিষ্পত্র খোয়াই

কাদের জন্য আমি ছুটে এলাম
রাক্ষসের হাঁ-এর মত এই শূন্য মাঠে !

অথচ বৃষ্টির মেঘ আমাকে ডেকেছিল
লাল মাটির পথের পাশে খড়ের চালায়
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছি ধারাবর্ষণে
অকস্মাৎ বারাঙ্গনার কটাক্ষের মত
এক ঝলক রোদ
আমাকে এখানে এনেছে, এই শূন্য মাঠে।
খোয়াই জুড়ে যে তালের সারি
বর্ষার আকাশ মাথায় নিয়ে দাঁড়াত
তাদের জন্যই আমার ছুটে আসা
ময়ূরাক্ষি ক্যানালের ধার ঘেঁষে
সাঁওতাল মেয়েদের মত উচ্ছল
যে শাল আর সোনাঝুরির অরণ্য
তাদের জন্যই ত আমি আজ এখানে।

অথচ এখন খোয়াই-এর লাল বুকে
যৌনব্যাধির বৃত্তাকার ক্ষতের মত
সারি সারি কাটা তালগাছের গোড়া
ভাঙনের কারিগরের হাতে
জলধারার নিপুণ ছেনি
কোথাও ফোটাচ্ছে আটচালার আদল
কোথাও বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুতুল
অভিমানী হা হা দৃষ্টি ছুটে গিয়ে
বিদ্ধ হচ্ছে প্রান্তিকের ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালে
সহসা মাঠ ফুঁড়ে কয়েকটা আলাদিনের প্রাসাদ :
অবসর জীবনের সাংস্কৃতিক উদ্‌গার।
রামকিঙ্করের উলিঝুলি মাথার মত
ছড়ানো ছিল যে সাঁইবাবলার নিসর্গ
তার জায়গায় এপ্রান্ত ওপ্রান্ত
বিজলী তারের খুঁটি।

তবে কাদের জন্য আমি এখানে ছুটে এলাম
রাক্ষসের হাঁ-এর মত এই নিষ্পত্র খোয়াই-এ!

মিহির ঘোষদস্তিদার

আমাকে ক্ষমা করো

আমাকে ক্ষমা করো রবীন্দ্রনাথ
তোমার এ-ই সব জন্মদিনে
আমাকে যেতে বলো না

এ-ই সেদিন যে লোকটা
মেয়েদের শূলে চড়ানোর ব্যবস্থা নিল
সে-ও দেখছি তোমার এই জন্মদিনের মিছিলে,
যে লোকগুলোর কাছে মানুষের মূল্য নেই একেবারে

যাদের কাছে মানুষ পণ্যছাড়া আর কিছু নয়
যারা লোভের জন্যে, অর্থের জন্যে
মানুষ-মারার ব্যবসা ফাঁদে
তারাও দেখছি দিব্যি এসে গেছে
তোমার এই একশ' পঁচিশতম জন্মদিনে
কী চমৎকার এইসব ভণ্ডদের বিশ্বভ্রাতৃত্ব !

কখনো-সখনো তোমার কথা মনে পড়লে
ভেসে ওঠে একটা মুখ
মানুষের জন্যে যা কিছু ভালো
তাকে
বাঁচানোর তাগিদে
সব কিছু পণ করার ছিল যার ইচ্ছে

কাল থেকে আমি তোমার জন্যে সাজিয়ে রেখেছি
রক্তবর্ণ একগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়া
ইচ্ছে হয়, যে মিছিলে আমি হাঁটছি
তুমিও তোমার একশো পঁচিশ বছরের মুক্ত
অথচ
তেজোদৃপ্ত শরীরটা নিয়ে
আমার সঙ্গে অনায়াসে হাঁটতে পারো
হাঁটতে পারো অবিরাম
জীবনের যা কিছু ভালো
যা কিছু উজ্জ্বল
তাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে ॥

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

গাইড

এক একটা দিন এমনি করেই উঠে আসে—সকালবেলায়
গৃহপালিতের ডাক—বেলা বাড়তে না বাড়তেই সকলের
পায়ে ঝিলিক দিয়ে বেজে ওঠা মিহিকাজের সোনারুপোর
শিকল—তালগোল পাকানো গতিটাও পথ না পেয়ে
ঢুঁ মারতে থাকে সবদিকে—যদিও ঝর্ণার পাশে পৌঁছানোর
কোনো কথাই আমার ছিল না—তা বলে আগুনের তাপে
সবগুলো হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যাবে—আর শরীরটা
জ্যামুক্ত হতে পারবে না কিছুতেই—হাউজিং থেকে বেরিয়ে
আসা প্রজাপতিদের পায়ে ধাতব কোনো শব্দও বাজেনি—
দু-একটা ফিসফাস শোনা গেলেও কে আর জানত উচ্চতা
মানেই চিৎকার—পাখির বাসার খোঁজ করলে চোখে পড়ে
প্রতিমাহীন ডাকের সাজ—ঘোড়ার খুরের আওয়াজে
ফিরে তাকালেই ঘূর্ণিঝড়ের ফ্যাকফ্যাকে হাসি—
শুকনো পাতার হুল্লোড়—ধুলোর ধোঁয়াকার—
শূন্যকুম্ভের চেয়েও শূন্যতর আকাশের নিচে দুদণ্ড বসার
যায়গা নেই—ঝর্ণার পাশেও নয়—উৎসের গভীরেও
নয়—বেরোবার পথটুকুই বাৎলে দেবার মতো
ধারে কাছে গাইড নেই—কেউ-ই—একএকটা
দিন এমনি করেই উঠে আসে…

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ঘুম, স্বাধীনতা

শীতে
সারারাত শুনি
কুকুরের ডাক।

আমি যে কবিতা লিখি
সে-কবিতার পিছনের কবি
মিশে থাকে সমস্ত আওয়াজে।

দূরের মাঠের থেকে
জ্যোৎস্নায় ঠাণ্ডা খুব মৃদু হ'য়ে আসে—
শিশিরের জলে ভেজা আমার কবির
অস্বচ্ছায় শান্ত সেই আয়োজন জগতের কথা।

শীতে
এই রাতে আর
কিছুই আসে না মনে—
অচেনা পাখির মতো শব্দ ছাড়া…
ঘাস আর পাথরের, পৃথিবীর উজ্জলতা ছাড়া
সারাদিন কাজের উদ্যমে ক্লান্ত
মানুষের ঘুম ছাড়া…
অন্য কিছু সেরকম আসেনাকো
মনে—
অন্য কিছু—শুধু আজেবাজে।
আমার এ ভয়ঙ্কর শীতের ভিতরে
যেন সেই কবি শুধু পায়চারি করে
সারারাত অস্থির তিমিরে, কিংবা যেন স্বচ্ছতায়,
অস্ফুট স্মৃতির মতো অমোঘ সকালে
অভিভূত রৌদ্রের সমাজে।

এবার এ-মাঘরাতে
গভীর ঘুমেও তাই
খালি খালি ঘুরে যায়
ক্ষুৎকাতর মানুষের মতো একা ভাঙা
ঘেয়ো, ক্ষুণ্ণ, বিচ্ছিন্ন সুদূর এক
কুকুরের ডাক।

শীতে
সারারাত সেই কুকুরের ডাক
কেড়ে নেয়—
ঘুম, স্বাধীনতা।

তরুণ সান্যাল

পাহাড়ের ঘাড়ে একাকী

পাহাড়ের ঘাড়ে একাকী দীঘল বার্চের কাণ্ড উঠে যায় আকাশ আকুল,
পাশে কাকে সঙ্গী করবে, নিঃসঙ্গ একান্ত একা, এমনি কি জীবন ?
সে জীবনে বাঁচা বড় শক্ত, শুধু বিরোধী হাওয়ার সঙ্গে টক্কর বাজিয়ে।
ঢাক নেই, ডঙ্কা নেই, সভা অস্ত্রশস্ত্র নেই, যা আছে সে শুধুই কলম
এবং প্রবল গ্রীষ্মে খোলা গা হাওয়ায় খুশি, শীতে হাল্কা তুষ,
কিংবা দোলাইয়ের সঙ্গী ভুবন ডাঙ্গায় কিছু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ।
তাঁকে শ্রদ্ধা করা যায়, দূর থেকে প্রণামও জানানো যায়, বা ঈর্ষাও বুঝি,
তবু আসে যায় না কিছু, না কিছুই আসে যায় না, তিনি তো কাছেও থেকে দূরই
পায়ের পাপড়ির চাঁপা ছুঁয়ে বসেছে একাধিক সেদিনের অলোকসুন্দরী
বুঝি তিনি সেই সব বুক-মুখ-শ্রোণী থেকে চোখ তুলে শাল বীথিকায়
ঘন নীলাঞ্জন রেখা দেখেছিলেন, গর্জমান, ভক্তি এসে হাত জোড় দাঁড়িয়েছিল, আর
যা কেউ বুঝত না তাও কাগজ-কলম-রঙে রক্ত মাংস ছেঁচে এঁকেছিলেন,
এবং হিস্পানি নীলে বোমারুর চক্করে আরেকবার স্পষ্ট করে দেখেছিলেন ঘৃণা
আর তিনি দীঘল বার্চের মত বামন গুল্মের মধ্যে হাত বাড়িয়ে ধরলেন সূর্যকে
সদর স্ট্রীটের সেই বারান্দার বাইরে রাস্তা, সাজাদপুরে সেই টৈটম্বুর খাল
মানুষে ও মানুষের সৃষ্টি দুই-ই মিলিয়ে অবাক করা মহামানবের জন্ম দেখে
আমাদের জন্যে রেখে যান সেই আকাশের দিকে হাত বাড়ানো ইচ্ছাকে, যার নাম
বড়ই দুঃখের মধ্যে, যন্ত্রণায় ও আনন্দে, যা অনাবিষ্কৃত এক মহাদেশ অর্থাৎ জীবন ॥

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

দুঃখের মহত্ব

শোকের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে অনেকে
মাঠ পার হয়ে গেল।

মন্বন্তরের সায়াহ্ন বেলায় দু'একজন
প্রত্যয়ের মাটিতে বীজ পুঁতে গেল
গ্রামের শেষ সীমানায়
আগামী প্রজন্মের জন্য।

আমি—
একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দেখলাম
দারিদ্র্যের শোক-যাত্রায়
দুঃখের মহত্ত্ব !

শঙ্খ ঘোষ

অন্ধবিলাপ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন :
ধর্মক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে সমবেত লোকজনেরা
সবাই মিলে কী করল তা বলো আমায় হে সঞ্জয়

অন্ধ আমি, দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
কাজেই কোথায় কী ঘটছে তা সবই আমায় জানতে হবে

সবই আমায় বুঝতে হবে কার হাতে কোন্ অস্ত্র মজুত
কিংবা কে কোন্ লড়াইখাঁচে আড়াল থেকে ঘাপ্‌টি মারে

অন্ধ আমি, দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
এবং লোকে বলে এ দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে

কারা এসব রটিয়ে বেড়ায় বলো আমায় হে সঞ্জয়
অন্ধ আমি, কিন্তু তবু এসব আমায় জানতে হবে

তেমন-তেমন তম্বি করলে বাঁচবে না একজনার পিঠও
জানিয়ে দিয়ো খুবই শক্ত বল্লাতে এই রাষ্ট্র ধৃত

অসম্ভবের কুলায় আমার পালক দিয়ে বুলিয়ে যাবে
সেই আশাতে ঘর বাঁধিনি, দুর্যোধনরা তৈরি আছে

এবং যত বৈরী আছে, তাদের মগজ চিবিয়ে খাবে
খাচ্ছে কি না সেই কথাটা জানাও আমায় হে সঞ্জয়

সামান্ত এক ছটাক জমি ছাড়বে কেন আমার ছেলে
আমার সঙ্গে ভূমিসেনা আমার সঙ্গে ভূস্বামীরা

আমার সঙ্গে দ্রোণ বা কৃপ আমার সঙ্গে ভীষ্ম বিদুর
সেদিক থেকে দেখতে গেলে ধর্মরাজ্য এমন কী দূর

দুষ্টে বলে, মনে মনে তারা আমার কেউ না কি নয়
সেটাও যদি সত্যি হয় তো একাই একশো আমার ছেলে

তারাই জানে শমনদমন ধ্বংস দিনে ধ্বংস রাতে
ছড়িয়ে যাবে ঘটল যা সব আরওয়ালে কানসারাতে

যে যা করে তাকে তো তার নিশ্চিত ফল ভুগতে হবে
কোথায় যাবে পালিয়ে, দেখো সামনে আমার সৈন্যব্যূহ

তিনদিকে তিন দেয়াল ঘেরা সাতান্ন রাউণ্ড গান্ধীমাঠে
ভিজল মাটি ভিজল মাটি ভিজুক মাটি রক্তপাতে

অধর্ম ? কে ধর্ম মানে ? আমার ধর্ম শত্রুনাশন
নিরস্ত্রকে মারব না তা সবসময় কি মানতে পারি ?

মারব না কি নির্ভূমিকে ? নিরন্নকে ? নিরস্ত্রকে ?
অবশ্য কেউ মেরেছিল সেটাই বা কে প্রমাণ করে !

এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন
সৈন্যে শস্ত্র ছুঁড়ছে তা নয়—কোষ থেকে তা আপ্‌নি ছোটে

মাঝে মাঝেই ছুটবে এমন—ব্যাস তো জানেন আমার দশা
এই যে আমার একশো ছেলে—কেউ বশে নয় এরা আমার

এইরকমই অন্ধ আমি, আমিই তবু রাজ্যশিরে
—কিন্তু কারা শপথ নিল নিজেরই হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ?

ধানজমিতে খাসজমিতে সমবেত লোকজনেরা
ধেয়ে আসছে সামন্তদের—কেন এ দুঃস্বপ্ন দেখি ?

পুব থেকে পশ্চিমের থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কে
অক্ষৌহিণী ফিরবে বলে কদি করে আসছে বেঁপে ?

লোহার বর্মে সাজিয়ে রাখি কেউ যেন না ঝাপটে ধরে
স্বপ্নে তবু এগিয়ে আসে নারচ ভল্ল খড়্গ তোমর—

এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন
নিদেনকালে সমস্ত দিক নাশকচিহ্নে ছড়িয়ে যাবে

সন্ধ্যাকাশে দুই পাশে দুই শাদা লালের প্রান্ত নিয়ে
কৃষ্ণগ্রীব মেঘ ঘুরবে বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত

বাজশকুনে হাড়গিলেতে ভরবে উঁচু গাছের চুড়ো
তাকিয়ে থাকবে লোহার ঠোঁটে খুবলে খাবে মাংস কখন

মেঘ ঝরাবে ধুলো, মেঘেই মাংসকণা ঝরিয়ে দেবে
হাতির পিঠে লাফিয়ে যাবে বেলে হাঁস আর হাজার ফড়িং

কাজেই বলো, হে সঞ্জয়, কোন্ দিকে কার পাল্লা ভারি ?
জিতব ? না কি নিদেনকালের জাঁতায় পিষে মরব এবার ?

সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধেক কি ছাড়তে হবে ?
টুকরো টুকরো করব কি দেশ পিছিয়ে গিয়ে সগৌরবে ?

যে যাই বলুক, এটাই ধ্রুব—আমার দিকেই ভিড়ছে যুব
তবুও শুধু ব্যাস যা বলেন সেটাই কি সব ফলবে তবে ?

ফলুক, তবু শেষ দেখে যাই, স্যাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়
ইঙ্গিতে-বা বলছে লোকে আমার না কি মরণদশা

বাজশকুনে হাড়গিলেতে তাকিয়ে আছে লোহার ঠোঁটে—
ধানজমিতে খাসজমিতে জমছে লোকে কোন্ শপথে

কিসের ধ্বনি জাগায় দূরে দিকে এবং দিগন্তরে
দেবদত্ত পাঞ্চজন্য মণিপুষ্পক পৌণ্ড্র সুঘোষ

শেষের সে রোষ ভয়ংকরী সেই কথাটা বুঝতে পারি
কিন্তু তবু অন্ধ আমি, ব্যাসকে তো তা বলেইছিলাম

বলেছিলাম এটাই গতি, ভবিতব্য এটাই আমার
আমার পাপেই উশকে উঠবে হয়তো-বা সব খেত বা খামার

উশকে উঠুক উশকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয়পিনাক
সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে যাক

কোন্ খেতে বা কোন্ খামারে সমবেত লোকজনেরা
জমছে এসে শস্ত্রপাণি বলো আমায় হে সঞ্জয়

সমবেত লোকজনেরা কোথায় কখন কী করছে তা
শোনাও আমায়, অন্ধ আমি, শোনাও আমায় হে সঞ্জয়

শোনাও আমায়, শোনাও আমায় শেষের সেদিন হে সঞ্জয় !

সুনীলকুমার নন্দী

দুঃখের শরিক

কী তুমি জেনেছ ? এই
ফুল, মালী, কোলাহল, উৎসবের রঙ
দেখে তাকে যা ভেবেছ তাই সব নয় ।

দুইয়ে-দুইয়ে চার হওয়া অঙ্কের নিয়মে
তুমি
বাড়িঘর এমন কি তার চুল থেকে পদতল
সমস্ত শরীর
আতিপাতি যতই খোঁজ না কেন,
পেরেছ কি ছুঁতে তার বুকের গভীর, বুক
যে কিনা রেখেছে ধরে
উড়ে-যাওয়া নীল পাখি, ব্যথাময় স্মৃতি, অন্ধকার ?

পারবে না, পারে না কেউ
না-জাগালে সুখ-দুঃখ অনুভবে
রক্তের পরাণকথা, অপূর্ণ যে-দাহ—
তা না-হলে
শিরা-উপশিরা ছেঁড়া দুঃখের শরিক
হতে গিয়ে
ভুলস্রোতে পাড়ি তোলা ; ভুলস্রোতে পাড়ি তুলে
কে কার দুঃখের ভার তুলে নিতে পারে !

সুনীল হাজরা

স্বপ্নের কেতন

এতো আলো চাই না জীবনে,
কিছু অন্ধকার থাক,
থেকে যাক বুকের ভিতর।
নিজস্ব ব্যর্থতাগুলি
মাঝে মাঝে পীড়া দিক মনে,
না-হলে কেমন আছি
না তাকিয়ে পিছনের দিকে
বলবো কেমনে !
সকলেই তৃপ্ত থাকে
নিজস্ব নিয়মে।
যদিও পিছনে
অনেক অনেক পথ
ইচ্ছার আগুনে
পুড়ে গেছে।
তবুও এখনো তার মনে
অসংখ্য উজ্জ্বল তারাগুলি
ছুঁতে চায় চিন্তার মাটি,

পথটা অগম্য বুঝি
বুঝি তার জীবনটাই মেকি !
হতে পারে…
কী জানি কথন
আলো অন্ধকার ছোঁয়
জীবন কী স্বপ্নের কেতন ।

মণীন্দ্র ঘটক

হবি তো হ

তোর ইচ্ছে
যা চাস যা খুশি
কর বা ধর এক মুঠ
গুচ্ছ গুল্ম সুপক্ক ওষধি
বিশল্যকরণী
তোর ইচ্ছে ।
হবি তো হ
একলব্য, নয় হনুমান ॥

তুচ্ছের বিনিময়ে

যদি যাই সমুদ্রের কাছে
একটা বটপাতার অভাব থেকেই যাবে ।
পাবো না কোথাও ভাসিয়ে দেবার মতো
তুচ্ছ এক বটপাতা
তাই নিজেকে ভাসাতে হয়
তুচ্ছের বিনিময়ে কেবল নিজেকে ॥

শ্যামসুন্দর দে

মিনার

পোশাকে রক্তের ছাপ,
খুনের প্রতিবিম্ব
হাতের আঙুলের নোখে।

তুষার ঢাকা হিমালয়ের রূপালী ছায়া থেকে
পাঞ্জাব দিল্লী আসাম হয়ে
আহ্‌মেদাবাদ,
কী বিপুল আমার পদ সঞ্চালন!
সব জায়গায় আমি ছড়িয়ে দিই
আমার মন্ত্র
হিংসা-সার ঘৃণার তুলিতে আঁকা
খুনের কী অপূর্ব ছবি।

আমি তো খুন করেছি সেই পাখিকে—
ভোরের নরম রোদে মাথার উপর উড়তে উড়তে বলেছিল
দিন শেষে সন্ধ্যায় ফিরে আসব
আমার ভালোবাসার বাসায়।
আমি তো দুই হাতে ছিঁড়ে দলেছি
গাছের সেই কুঁড়িগুলো
যার ফুলের সুরভিতে মৌমাছি আসত—
ভরাত মধুর ভাণ্ডার।
আমি প্রচণ্ড ধমকে ছেলেটার মুখের হাসি মুছেছি
সেখানে এঁকেছি এক ভয় আর জিজ্ঞাসার ছবি।

পর্বতশিখর থেকে অন্তরীপে
আমি সৃষ্টি করি এক এক হত্যার দ্বীপ,
যেখানে নিষেধ ফুল ফোটা,
নিষেধ পাখির গান গাওয়া,
নিষেধ ভালবাসার স্বপ্ন।

অথচ আকাশ আড়াল করা মেঘ
সেখান থেকে ভেসে আসে অসংখ্য পাখির গান
বাতাস বয়ে আনে বনফুলের গন্ধ
মৌমাছি ছুটে যায় মধু ভরাতে।

আমি কি পরাজিত!

বনানীর পাতায় পাতায় তীব্র নির্দেশ
মুছে নাও চোখ থেকে খুনের ছায়া
আঁকো ভালোবাসার স্বপ্ন
যেখানে খুনের সমাধিতে উঠবে
গঠনের গর্বিত মিনার।

রবীন স্থর

দীক্ষা নিতে হবে

ছ' হাজার বর্ষব্যাপী আমাদের কৃষিসভ্যতার
মতো কিছু মণিমুক্তা, ছেঁড়া-কাঁথা-মোড়া।
অধীত বিদ্যার শিক্ষা যতটুকু, তার চেয়ে বেশি
অভিজ্ঞতা উৎসারিত বইহীন গ্রামীণ মননে:
মৌসুমী মেঘের ঢল, ঘন বৃষ্টি মাটির উল্লাসে
বীজতলার ছোট্ট চারা জো-আসা খেতের দিগ্বিদিকে
সবুজ স্বপ্নের ঢেউ, ঘন দুধ জমে ওঠা বীজের ভিতর,
লাঙলে পেশির ঘাম হেমন্তের সোনালী খামারে
নবান্ন উৎসব। শস্য, মেটে রাস্তা বেয়ে বরাবর
ফিরে আসে আতরের গন্ধমাখা যোগ্য পুরস্কারে।

কুমোরের চাকা ঘোরে। মাটি-পোড়া তৈজস, পুতুল
জাগ্রত তাঁতের মাকু, শোলা রাংতা, শারদ প্রতিমা—
শাদামেঘ ঘন কাশ কাকচক্ষু নিশ্চিন্ত পুকুরে
নিয়ত বুড়বুড়ি ওঠা ঝাঁক ঝাঁক মাছের সংসার।

দেবতা মন্দিরে নেই, ভূমণ্ডলে সবার ওপরে
মানুষকে রেখেছে কবি। শ্রেষ্ঠ প্রেম দিতে পারে রামী
যদি তার মধ্যে থাকে চিরন্তন কাব্যের রমণী।

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, মহাজনী সুদের তাগাদা,
পাশাপাশি সহৃদয় তেঁতুলপাতায় সুজন ন'জন,
মন্ত্র নয় তন্ত্র নয়, অলৌকিক জড়ি বুটি কোনো কিছুতেই
ধ্রুব মান, আর হুঁশ মুছে দিতে এখনও পারেনি।

যা নেই তার্কিক দ্বন্দ্বে টিকি যতো নড়ে, সরাসরি মানবিক
পুরনো গয়নাগুলি খাদহীন, লোক-গাথা বাউল গানের
মরমী বাণীর ছোঁয়া, ঠোঁটে-গাঁথা বাবুই বাসার
শিল্পীত ঘরের মধ্যে আলো জ্বালে জীবন্ত জোনাকী।

জ্ঞানহীন বিজ্ঞানের লংকা-দর্প, দৃষ্টি নেই কূট দর্শনের
সমস্ত তত্ত্বের খড় ঢেকে দিতে মাটি চাই, পটুয়া মনের
তুলিতে অর্জিত স্বপ্ন ইন্দ্রধনু প্রতিমাকে গর্জন তেলের
পোঁচে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জলজ্যান্ত প্রতিরূপ দিতে পারে রামচন্দ্র শুধু,
মাটিতে শেকড় আছে পরিশ্রুত বকযন্ত্রে অকালবোধন।

বাদল ভট্টাচার্য

আমার হৃদয় জুড়ে

আমার হৃদয় জুড়ে সারাক্ষণ বৃষ্টি হয়
সারাবেলা ছায়াচ্ছন্ন বনের নিবীড় ;
শঙ্কিত জলের ঘ্রাণ দুরন্ত পিপাসা
ক্রমশ ভেতর ভাঙে, আনন্দ অধীর।

পৃথিবী পুড়েছে ঢের চৈত্রের চিতায়
পুড়েছে পবিত্র প্রেম আকাশ মাটির ;
দুঃখের দর্পণে তবু দগ্ধ অবকাশে
আঁকা থাকে ভিন্ন ছবি সশ্রদ্ধ পাতায়।

সবুজ সান্নিধ্যে এসে সব দুঃখ শেষ হয়
স্তব্ধ হয় জীবনের সমস্ত সংঘাত ;
পবিত্র পতনধ্বনি ছিন্ন করে নষ্ট ঋতু
শস্যকে সমৃদ্ধ করে এড়িয়ে আঘাত।

আমার হৃদয় জুড়ে সারাক্ষণ বৃষ্টি হয়
সারাবেলা ছায়াচ্ছন্ন বনের নিবীড় ;
অবিরাম মগ্ন সুখ গভীর আশ্লেষে
ক্রমশ ভেতর ভাঙে, আজন্ম অস্থির।

শিবশম্ভু পাল

দুর্গেশনন্দিনী

ঘরের মধ্যে দুর্গ দুর্গদুয়ারে পরিখা
সহস্রাক্ষ প্রহরীর ছিল আনুগত্যের তরিকা।

পরিখার ধারে কবে হেসেছিল শ্বেতকরবী
সেই একবার বলিভুক হতে ভুলে গিয়েছিল পরভৃৎ।

নষ্ট চাঁদের নীচে জোয়ারের সমারোহ
মধ্যরাতের পরিকাঠামোয় হঠাৎ রাজদ্রোহ।

অগ্নিকাণ্ড লুণ্ঠন দিশেহারা অনীকিনী
কখন কোথায় খালি পায়ে হাঁটে দুর্গেশনন্দিনী।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কর্ণ

ও নদী, তুমি সমুদ্রকে আমার কথা বোলো।
তোমার জলে মিশিয়ে দিলাম সুনীল নীরবতার
কষ্ট, দিলাম বুকের থেকে জমাট-বাঁধা নুড়ি,
মরা গাছের হলুদ পাতা, বসত বাড়ির মাটি—
নদী, তুমি সমুদ্রকে আমার কথা বোলো।

হাঁটতে হাঁটতে সন্ধেবেলায় তোমার সঙ্গে দেখা।
দু পায়ে এত ক্লান্তি, তাই ভাসতে চেয়েছিলাম,
তোমাকে দেখে হাওয়ার হাতে বিছিয়ে দিয়ে শরীর
বলেছি—নাও, কর্ণ আমি, আমাকে নিয়ে যাও
গোসানি গাঁয়ে, যেখানে একা জাগেন অধিরথ,
তাঁর ঘরণী রাধার কোলে আমার কাঁথা পাতো।

এখন আমার রথের চাকা আহার মেদিনীর।
ছিন্ন ধ্বজ, কাটা শালের কাণ্ড দুটি ভুজ।
সূর্য-সনাথ-কপালে দাঁত শ্মশান-শেয়ালের,
কুন্তী ছাখেন তারার আলোয় আত্মজের মুখ।

আমাকে খোঁজে গোসানি গাঁয়ে বৃদ্ধ অধিরথ
এবং মাতা রাধার চারচোখের ঘন তিমির।
হাওয়ার হাতে কালের হাতে ভাসিয়ে পরিণাম
সঁপেছি সব তোমাকে, তুমি মিলিয়ে যেতে যেতে
ও নদী, ভরা সমুদ্রকে আমার কথা বোলো।।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রত্যাবর্তন

দেশবিবেচনার দিন শেষ, এবার কি ঝর্নার আলোচনা!
যারা মানুষের সর্বনাম, তাপ-শীত নিয়ন্ত্রিত নৈরাজ্যসভায় শুধু বচনফকির
দৈনিক দুঃসংবাদপত্রের তারাইতো বিবরাশয়,
প্রতি জাগরণবেলা করে তোলে লোনা
ছন্নলাপ ছবিতে ছবিতে হায় সকালের সূর্যও অস্থির।

যে ভাঙন শুরু সেই সন-চল্লিশ-সাতে
নতুন টুকরোর ত্রাণে সে কি কোনো সংক্রান্তি সাজাবে! এক হাতে
সাহেবগ্রন্থ অন্য হাতে কুটিল ট্রিগার, রক্ত যেন বৃষ্টিরও কনিষ্ঠ
অবিরল ঝরে আর স্বাধীনতা রোগা হয়; চোখে যা নির্দিষ্ট

সেই শোচনাসলিল আজ বিবেকের ঠিকানা ভুলেছে, ক্রন্দন
যেন না-ঝরা চাষীর মেঘ বস্তুত বিদেশী !
উনত্রিশ বছর তবে বড় বেশি আশা করে গেছি
প্রতিবাদের আয়ু স্নায়ুকে করেছে আজ স্থায়ী প্রতারণা,
একটি অক্ষরও আমি পৌঁছে দিতে পারিনি পারবো না
ঐ সব জনতাচর্চায় মগ্ন ভাষণপ্রধান করোটিতে,
আমাদের নেই ঋষি-আয়ু, যার উপনিষদীয় সংবিতে
স্বাধীনতাকে আজও বলা যায় এক হাঁটি হাঁটি পা পা টহলবালক
যে নাকি ভুলেছে ধুলো, জানে না যে ফুলের কোনটি কুরুবক !
হে কুহক ! হে জনগণনির্বাচিত বছর বছর ধাপ্পা, মানচিত্র-স্বদেশ
ভাষার আশায় ভাসিয়ে কখনো আর রাখবো না তোমাকে !
রোজ সূর্য একলাই ওঠে, অন্ধকারই দল গড়ে. নিশিডাকে ডাকে
আমি চিৎ ও আকাশমুখো শুয়ে মৃত্যু অভ্যাস করি, স্পষ্ট
বুঝি হে দেশ তোমার জন্য, কবিতাকে এতদিন কিভাবে করেছি নষ্ট,
আজ তাই ফেরাতে চাই ঝর্নার ঝংকার, শিশির সরিয়ে ওড়া আশ্বিন পাখি,
সম্বল শিউলিকে বুকে চেপে চোখ বুজে থাকি।

কীটপতঙ্গের জন্য ফোটা ফুল মানুষ একদা ভুল ভালবেসেছিল বলেই
ফুল কবিতায় শ্মশানসাহসী হয়েছিল, সেই
কুসুমসমাপ্ত ছাই দুহাতে সরাই
আর "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই
মরি"—আমোদগাড়ল হয়ে গলা ছেড়ে গাই।

রত্নেশ্বর হাজরা

তবে

বাড়িয়ে দিয়েছে হাত ঠিকই, তবে সেই হাতে
ইস্পাতের খোলস এখন
বাড়িয়ে দিয়েছে কান ঠিকই, তবে সেই কানও
এখন বধির

দু'চোখ তাকিয়ে আছে তোমার দিকেই, তবে
সেই চোখ স্বেচ্ছা-অন্ধত্বের
মুখে যে-হাসিটি লেগে আছে—তারও
একাধিক অর্থ করা যায়
ভিতরে যে ডেকে নিয়ে এলো—সে-ই পিছে
বাঘনখ আস্তিনে লুকিয়ে
কারো ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।
যা কিছু বলার ইচ্ছা—সবই
বলে ফেলতে পারো, কিন্তু বলে
পালাবে কোথায়।

দীপেন রায়
১৩৯৩
১

উত্তর থেকে দক্ষিণ গঙ্গার সমস্ত জল আমি পেতে চাই
আমার গণ্ডুষে
পাথর নুড়ির চেয়ে গোটা হিমালয় আমার না-হলে চলে না
শুধু শরীর নিয়ে কে কোথায় গিয়েছে উৎসবে
আমি চাই তোমার মনও।

তুমি টুকরো করো আমি জুড়ে যাই অরণ্যভুবন
তুমি ছিন্ন করো আমি গেঁথে যাই মাটি ও জলকে
এ না-হলে আমার চলে না
আমি শুধু পেতে চাই আকাশের সবটুকু নীল
আমি চাই তোমার মনও।

২
দুলতে থাকে বুকের ভিতর অন্ধ আলোর আবেগটুকু
একলাবিকেল, নেহাৎ তুমি কুড়িয়ে নিলে আঁচল ভরে,
৩

পায়ের তলায় নাড়া-বাদা, স্বপ্ন মেখে দাঁড়িয়ে আছি,
ছিন্নমুণ্ড ধরাশায়ী, সোমেশ্বরী ও-বালুচর
টংকনারী বুলেট বিদ্ধ, মনে আছে রাসমণিকে !

কোথায় এলাম ভুলতে ভুলতে কোমর-ডোবা-জলা-পুকুর
স্মৃতির পাতা উল্টে-পাল্টে ফিস্‌ফিসানি বয়স বাড়ে
ভাসতে ভাসতে এপার-ওপার তিজেল হাড়ি, সবটুকু সুখ
মুড়িয়ে গেল নটেসুদ্ধ ঘাটের পানি হাওয়ায় ভেসে—
একলা আমি ধূসর স্মৃতি দাঁড়িয়ে পড়ি আচম্বিতে ॥

নীরেন্দু হাজরা

এক গেলাস তৃষ্ণা

এক গেলাস তৃষ্ণা ছিলো বুকের ভিতর
মানুষ দেয়নি জল, মানুষ দেয়নি
সাড়া,···, পাশে কানা নদী ছিলো
ছল্ ছল্। শ্মশান চিতায়
জ্বলে যায় অহরহ আমাদের লাশ···
এক গেলাস তৃষ্ণা নিয়ে আমার এভাবে ঘরে ফেরা
এভাবে জীবন, এভাবে ইশারা
জোয়ারের জলে যেন অদ্ভুত তামাসা···
এ শ্মশানে কে আছেন ? অনন্ত মর্মর—
আমি ছাড়া, কোন ছায়া নেই
কান্না নেই—, কবি নেই
আছেন চণ্ডাল যেন আগলে আমাকে···।

এই দ্যাখো আমাদের লাশ কোঁচড়ে পুরেছি
পরস্পর—, ফুল নয়, মুদ্রা নয়
দু'চোখে পাতার ছায়া
একটু আশ্রয়···

সন্তোষ চক্রবর্তী

শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না

এখন শুক্লপক্ষ, অতএব তোমার মেখলা
সজীব।

মনের মতন লোকজন এতোদিন
এবড়োখেবড়ো অন্ধকারে চেঁচামেচির পর
আষ্টেপৃষ্ঠে খুব
রথের চাকার মতো ঘুরছে।
কখনো শিষ-ধ্বনি কখনো কাড়ানাকাড়া।

যেন পরব।
আকাশখানা চৌচির করে ফেলে
পালকের গায়ে রঙ।

এখন বুধে পা, অতএব তোমার গালিচা
বিছানো।
মানুষজন তো ঠিক ঈশ্বরের মতো
যার নামে
হলফ নিতে হয়।
তারপর নিজের সাক্ষ্য, নিজের সংসার।

নৌকোয় শস্য উঠছে, আর
নতুন কয়েদীর গলায় তোমার সেই
পুরাতনী গান।

এখন অপলক জ্যোৎস্নায় মাঝেমধ্যে কাক
ডেকে ওঠে।

কমলেশ সেন

আমি জানি না

এখানে জীবন পাতা-ঝরা গাছের মতো।

তবু মানুষ দখল নিতে চায়
বাপ-দাদার চাষ করা জমির ওপর।
জমি যে কি জিনিস
তা জমি থেকে উৎখাত চাষীরাই জানে।

একফালি জমির জন্যে
জান কবুল-করা
কোন চাষীর কাছেই তেমন কোন ব্যাপার নয়।

চোখের ওপর তো
সামন্ত প্রভুর কোন অধিকার নেই।

এক মুঠো ভাত
বা এক ফালি জমিই তো
চাষীর সত্যিকারের জীবন।

আমি জানি না
জীবন বলতে কবিরা কি বোঝে!

কাব্যের ভাষা,
না, জমির ওপর নিঃশর্ত অধিকার!

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

২৫শে বৈশাখ ১৩৯৩

কীভাবে আরম্ভ হবে আমি তা জানি না।

গলা পিচ লরির চাকায়
ছড়ায় রাস্তার দুইদিকে —
এ অঞ্চলে মন্দারমালিকা নেই, নাচে না অপ্সরা,

পদাতিক নেই, চড়ুই বা শালিকও নেই—
গগনে আগুন আর নিচে
খররাতি খরা

ঠাণ্ডা ভাতের মত বেলকুঁড়ি রাত্রির আকাশে।
এক হাতে লাল গোলাপ অন্য হাতে জুয়া—
বরেণ্যকে অরণ্যে পাঠাও,
স্পষ্ট হোক অন্ধত্ব, অসূয়া।

মূল দ্বন্দ্ব আড়ালে লুকিয়ে
চুল খুলে শোও কাছাকাছি,
তুমি ভাবো আর কারো কথা
দিব্যি ঘুমে অন্যলোকে আছি।

যায় দিন মেধাবী ঘর্ষণে,
সন্ধ্যা আসে অদূর দর্শনে।

উদ্‌বৃত্ত মূল্যের মদে সৃষ্টি করি অপূর্ণ পরমা,
তোমার বিকীর্ণ জন্মদিনে—
পাপীকেও করে দাও ক্ষমা,
তবু যেন কিছু থাকে বাকি—
চতুর্দিকে আক্রান্ত বৈশাখী।

তুমি আমি মিলে হবো এক,
এক থেকে সংক্রামক প্রচণ্ড শতেক,
দেখে যাবো ঘাসে ও আগুনে অভ্যুদয়ে
বাজে কিনা নিখিলের বিদ্রোহের বীণা—
কীভাবে যে শেষ হবে শেষ
আমি তা জানি না।

শুভাশিস্ গোস্বামী

শীতের সাপের মতো

শীতের সাপের মতো পড়ে আছো খড়ের আরামে,
মাঝে মাঝে খোঁচা খেলে নড়ে-চড়ে ওঠো।
তবে এই হিমঘুম চেয়েছিলে নাকি?
ভিতর-বাহির জুড়ে, এরই জন্যে তবে এত রক্তক্ষরণ?
বাতাসে মিশেছে কত বিবাদ ও প্রতিবাদ,
অশ্রু ও শপথ,
লোনা ঘাম ঝরেছে মাটিতে।
সে সব এখন যেন স্বপ্নের মতন মনে হয়।

চেয়ে দেখ গোধূলিসন্ধির আলো নিভে এলো,
গড়িয়ে পড়ছে এক কঠিন ধাতব অন্ধকার,
সেই অন্ধকার নিয়ে লোফালুফি করবে যারা, তারা
ঠিক ঠিক জায়গায় ওত্ পেতে আছে।

এসব তোমরা আজ বুঝেও বোঝ না,
তোমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু
ক্যানিউট-স্তাবকের দল।
তরল শীতল ঢেউ আছড়ে এসে পড়ে যদি পায়ে,
তখন চেতনা হবে? নাকি কালঘুমে
ক্রমশ তলিয়ে যাওয়া
আর শুধু মৃত্যুর আরতি?

আনন্দ ঘোষ হাজরা

গতানুগতিক

আন্দোলন থেমে গেছে হাওয়ায় উদ্বেগ নেই আর।
যেন বা প্রগাঢ় স্থিতি, জাড্যঘন, স্বাভাবিক ভর
অথবা স্নায়ুর ক্লান্তি দীর্ঘল বিস্তৃত হয়ে রৌদ্রে রৌদ্রে ঘোরে;

পাথুরে সময় যেন স্তূপাকার ক'রে রাখে
পাহাড়ের মত অবসাদ —
আন্দোলন থেমে গেছে ; যেন জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ
নক্ষত্রে ঢেকেছে গ্রাম, মাঠ, নদী, মাটি ও ফসল।

রামপদ জেল খেটে ফিরে আসে, ফের খুঁজে পায় ভাঙা-ঘর
তৈলবিহীন কুপি, সলতে নেই, ছিন্ন মাদুর
কীর্তনমুখর গোবা ভেঙে পড়ে আছে এক কোণে
বৌ খুব আনন্দিত ডোবা থেকে তুলে আনে
এক তালপাতা ভর্তি অজস্র শামুক
মানুষ ফিরেছে ঘরে হাওয়ায় উদ্বেগ নেই আর…

সবই ঠিকঠাক আছে, রামপদ লোহারের তীব্র শীর্ণ চোখ
শুধু ছাখে শুকনো শাল, ঝরাপাতা, অনুরাগ, রোদ… ‥

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

পাগলাঝোরার গতিপথে

মৃতদেহের আড়ালে যে আত্মগোপন করেছে
তাকে বোলো
তার ডাক শোনার জন্যে
আমি অপেক্ষা করে আছি।
দেহটা মৃত হলেও মনটা তো মরে না।

পাগলাঝোরার গতিপথে তাই চিরকাল
এক আশ্চর্য মৃদঙ্গ ধ্বনি।
জল জমে জমে পাথর
নীরবতার মধ্যে জমাট
অজস্র কথা।

মৃত্যু যেন প্রশান্তির
ধ্যান মৌন গাভীর মগ্নতা।

তাই মৃত্যুর আড়ালে যে লুকিয়ে পড়েছে
তার দিকে
আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি—
জানি
সে একবার নিশ্চয়ই আমাকে ডাকবে।

উত্থানপদ বিজলী

দুঃখ নয় দুঃখ নয়

বটের ঝুরির মতো
নেমে আসে চিন্তাগুলো যতো,
দুঃখ নয়—
দুঃখ জানি মুখোমুখি ব'সে
গোপন ব্যাধির সঙ্গে সংলাপ নিরত।

একমাথা মেঘ নিয়ে চোখে ঘুম নেই—
এলোমেলো বাতাসেতে
অদূরে দাঁড়িয়ে ঝাউ শুধু দুলছেই।

বটের ঝুরির মতো চিন্তা শুধু নামে
দক্ষিণে ও বামে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নচারণার ভূমি

সকলেরই কিছু কিছু স্বপ্নচারণার ভূমি রয়েছে, যেখানে
বহু পদযাত্রা শেষে হতমান হৃতসর্বস্বেরা ভগ্নজানু টেনে টেনে
ফিরে আসে; সেরকম নিজেই চিহ্নিত কোরে রাখে
তার কবরের জমি

কেউ কেউ, দাম যা, মিটিয়ে দিয়ে তারপর নিশ্চিন্ত নির্ভার ;
পৃথিবীর সুখস্বাস্থ্য আনন্দের যাবতীয় উত্তরাধিকার
এ জন্মে নিঃশেষ কোরে যেতে পারলোনা বলে মৃত সম্রাটেরা
সঙ্গে কোরে নিয়ে গেছে পিরামিডে জীবন্ত মানুষ
ক্রীতদাস ক্রীতদাসী,
সোনার ভৃঙ্গার থেকে ছড়িয়েছে ফুলের নির্যাস,
তারপর শব হয়ে মমির ঈষৎ দূরে পাথুরে বিছানায় শুয়ে আছে।
তাদেরও তো স্বপ্ন ছিলো, শিশুদের, যুবক যুবতী বৃদ্ধ সকলের ছিলো।
ব্যথিত চোখের কোলে বিশাল পাখির ডানা শুয়েছিলো, থাকা স্বাভাবিক !
এই জগতের তারা অধিবাসী হয়ে উর্বরতা, বৈদান্তিক
পাখির মতন সব ফেলে রেখে উড়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তে—এরকম
অবিমৃষ্যকারী তারা ছিলো না ;
ফসল বুনে, ফসলের বোঝা বয়ে এনে
গোলাঘরে রেখে ওই ধুলোমাখা বালকের ঘর
সাজিয়ে রেখেছে ;
এই স্বপ্নচারণার ভূমি তাদেরও যেটুকু ছিলো, আমাদের নেই।

শিশির সামন্ত

অসংগতি

আমরা আরোহী নই, আমাদের নেই কোন উটের জাহাজ
শুধু দুরাশার এক মরুভূমি, আমাদের স্বপ্ন ছিলো, আশা
কল্পনার মুদ্রা ছিলো, সততার সাথে ছিলো জীবন যাপন,

তুমি বলেছিলে তবু আশাবাদী, মর্মান্তিকভাবে তা ফুরিয়ে
নিঃশেষিত যে জীবন, তুমি করো হতাশাকে প্রতিদিন জয় ;

তোমাকে দেখাবো আমি নতুন শহর, গাছপালা, ফাঁকা
মুক্ত বাতাসের এক প্রশস্ত আকাশ, ক্লান্তি ঘেরা গূঢ় হতাশ্বাস—
মর্মরিত হয়নিকো যে শহরে ; স্বপ্নে আমি প্রতিদিন দেখি
আমাদের পিছোয় বিশ্বাস !

আমাদের প্রত্যাশা পিছোয়, ইদানীং দেখি কদাচিত
স্বপ্ন, দেখি কদাচিত, পূর্ণতার মেঘে তুমি আততিতে
আমাকে প্রশ্রয় দাও কেন ? স্বপ্ন দেখাও কেন বারবার ?

আমরা আরোহী নই, আমরা বালির দেশ তৃষ্ণা নিয়ে পেরোতেই
যাযাবর বৃত্তি বাড়ে, এখানে অর্কিড, কাঁটা ঝোপ,
শুধুমাত্র জলসেচ লাবণ্যেতে, শস্য শ্যামল তুমি,
এই পরিবেশে কিন্তু মেলাবে না সাধ ও সাধনা, অসংগতি !

অজিত বসু

ভূত ও ভবিষ্যৎ

হাঁ করে আসত ভূত
সে ছিল গপ্‌পো
ছমছমে অন্ধকারে —
আসতো না, কিংবা হয়ত বা অপেক্ষায় ছিল
আসবে কি আসবে না, এমন দোটানা ।

সেই মুশকিলটাই হ'ল
হাঁ করে এল মস্ত হাঁ
বলল, কোথায় যাবি যা—
বলে উত্তর দক্ষিণ পূবে পশ্চিমে দিল তালা ।

দিলাম তারই গলায় মালা
হ'ল তরল লোহা পিতল গালা ;
ভূত বললে, আচ্ছা,
বেঁচে থাক শুয়োরের বাচ্চা ।

অমিয় ধর

কালের সন্ধ্যাই সমাগত

দ্বারকায় মসৃণ সচ্ছল মেদে মুষল পর্বের অভিশাপ।
হে কেশব! স্বার্থমগ্ন স্বজনের আলিঙ্গনে আত্মহারা তুমি।
তোমার-ই প্রশ্রয়ে, স্বেচ্ছাচারিতার মুষল প্রসব করে
যদুবংশ আত্মহননের পথে অনিবার্য গতি।
শিথিল স্নায়ুতে আজ আপসের দুর্বলতা ;—
হে কেশব, পাঞ্চজন্যে বর্বরতা ঠেকানো যাবে না!
আদরের বংশীধ্বনি প্রত্যাখ্যান করে,
দস্যুদলের সাথে স্ব-ইচ্ছায় চলে যাবে সহস্র গোপিনী!

গোকুলের কর্মিষ্ঠ জীবনে ছিলে,
রোদে-জলে কষ্টি পাথরের পেশী,
গোপবালিকার প্রেমে সিংহাসন পাতা—
একি শুধু পূর্বস্মৃতি ?
তোমার-ই তো জানা, ব্রজের রাখাল—
দুষ্টবলদের থেকে কেন শ্রেষ্ঠ শূন্য গোহাল!
তবে কেন দুষ্কৃতি দমনে ক্লৈব্য ?
একি স্বজনপোষণের আদি পাপ,
নাকি বয়সের দুর্বলতা ?

গুপ্ত ঘাতকের শরে মৃত্যুবরণের আগে
হে কেশব, প্রকৃত-ই স্বজন-সুহৃদ যারা
পাঞ্চজন্যে ডেকে বলো—
ফিরে আয়, বর্বরের কঠিন আঘাতে
কালের সন্ধ্যাই সমাগত।

মুকুল গুহ

আমাদের জীবন যাপন

পড়েছিল আলতা একফোঁটা ঝকঝকে
মেঝের শরীরে, কন্যা হেঁটে গেছে বুঝি, কিয়ৎক্ষণ
আগে, তাঁর ঝুমুরের শব্দ বেজেছিল, দিনান্তের রোদ্দুর
তখনও ম্লান, পাখিদের কলরব থেমেছিল, গৃহে তাঁরা
ফিরেছে দিনান্তে, তৃপ্ত, অতৃপ্ত পাখিরা—

শহরেও সন্ধ্যা নেমেছিল, সেজবাতি হাতে
কন্যা এসেছিল বুঝি, তার লাল ক্লান্ত, অস্থির চোখে কিছু
কথা ছিল, আজকাল আমাকে বলে না আর তার কথা।
তার পৃথিবীটা ভিন্ন হয়ে আমাদের বৃদ্ধ করে যায়,
দিনান্তের তৃপ্ত কিংবা অতৃপ্ত আমরা—

নদী একস্রোতা, নদী কি বোঝে না তার
মুগ্ধ তীরে কিশোর দাঁড়িয়ে, তাকে একটু সিক্ত করা
প্রয়োজন ছিল। নারী বহুস্রোতা, নারী কি বোঝেনা
তার মুগ্ধ জানু, স্তন ঘিরে সারাক্ষণ অপেক্ষা করেছে বয়স,
স্থির হয়ে দাঁড়ায় বাস্তব, আর অস্থিরতা, ঝড়—

তৃপ্ত, অতৃপ্ত পাখিদের সঙ্গে আমাদেরও
সিক্ত হতে সাধ যায়, তাই ফেরা, তাই ঘরে ঘরে ফেরা।

প্রদোষ দত্ত

একদিন সেইদিন

চারিদিকে মিছিলের বন্যা, কোলাহল,
বুকের হাপরে হামা দিয়ে ছোটে কাকুতি-প্রয়াস,
সমাজ সংস্কার মানুষ ঈশ্বর ধুলিসাৎ!
শুধু প্রকট হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর আকস্মিকতার তাণ্ডবরূপ।
কোথাও বীভৎস ভাঙন, ভেঙে পড়ে
ঘরবাড়ি গাছপালা ক্ষেত-খামার।

মানুষ ভেবেছিল ঘর আছে, আছে
প্রেম-ভালোবাসা, প্রিয়জন,
দেবতা-মন্দির আছে।
এখন কিন্তু যেদিকে তাকাও নাড়া-ওঠা জমিন,
চারিদিকে মরাগাছ, কোথাও ধিকিধিকি দাবানল,
হাড়ের জাঙ্গাল।

একদিন সেইদিন এই হাড়েই
বাস্তিল দুর্গ ভাঙার মত জোট বাঁধে,
শঙ্কা মুছে যায়।

অলককুমার চৌধুরী

এখনো সময় আছে

ডুমুরের ফুল তুমি, সাবেকি জোয়ার
আঁচলে রেখেছ ঢেকে
পারবে তা কতদিন আর
মন কেমন বাতাসে সরে যাবে
বুকের বসন
সামনে দাঁড়াবে এসে
থরথর ঠোঁটের কাঁপন বলে দেবে
আগুনের কথা হৃদয়ে গোপন
সুদীর্ঘ শাড়ির পাড়ে বেদনার চোরকাঁটা গাঁথা

তবে কেন অকারণ উদাসীন অবহেলা
বাসন্তিক স্বচ্ছ জলে
বয়সের পলি মিশে গেলে
সেই ঘোলাজলে
যাবে নাকো দেখা আর হৃদয়ের মুখ

কোন্ সে স্মৃতির হাতে সঁপে দেবে
তোমার অসুখ
শূন্য খাঁ খাঁ প্রথম বয়স
বাঁজা মাঠ কাঁকরের কাঁটা
জীবনের মজা বিলে দল দাম শুধু দল দাম

এখনো সময় আছে
নেমে এসো শ্রাবনের জলে ও কাদায়
পাশাপাশি আনত ভঙ্গিতে
সারি সারি রুয়ে যাই জীবনের সেরা বীজধান।

কালীকৃষ্ণ গুহ

বসন্তের হাওয়া

বসন্তের হাওয়া, তোমাকে পেলাম আজ ব্রীজ পার হয়ে।
ব্রীজের মাথায় কারা তুচ্ছ এক নিশান তুলেছে?
ব্রীজের এপাশে দেখি পরিত্যক্ত বৃদ্ধদের জন্য এক
বাড়ি গড়ে উঠেছে খুব দ্রুত।
পৃথিবীর নাগরিক তারাও যাদের কোনো বাড়ি নেই, পরিজন নেই।
তারা কেউ ক্ষীণ দৃষ্টি, কেউবা বধির, তবু
পৃথিবীর পরিচয় পেতে চায় অত্যন্ত আগ্রহে।
দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরতে চায় কিছু —
অনুভব ক'রে নিতে চায়।
যুদ্ধ হবে কিনা ভাবে। ভাবে:
যুদ্ধ হবে না কখনো, ক্রমশ শান্তির দিকে যাবে এ সভ্যতা
অস্ত্র ঘৃণা রক্ত অতিক্রম ক'রে যাবে।
ভাবে: দূরে ওই হাসপাতালের মাঠে দেবদূত নেমে আসে
রোজ সন্ধ্যেবেলা
মৃত্যুহীন পৃথিবীর থেকে।

বসন্তের হাওয়া, তোমাকে আমার মতোই তারা গ্রহণ করেছে।

শুভ বসু

প্লাবন জোকার

দু চোখের সেই অনাবৃত আলোয়
জাগল যখন জোয়ার,
তখন আমার অন্ধকারের কেন্দ্র জুড়ে
হেসে উঠল বজ্রমাণিক।

ধূ ধূ বালুর চতুর্দিকে হাড়ে ও কঙ্কালে
দিগন্তটান লাগল তৃষ্ণা দহন তপ্ত হাওয়ায়,
মেঘের ছোঁয়া যেন অহল্যা মাটির ভয়ত্রাসে
শ্যামল স্বপ্নে রোমাঞ্চ আনে, সারা আকাশ মুখর হয়ে উঠে
সিঁদুর এবং পলাশ নিয়ে জলে স্থলে তুফান তুলে দেয়।

এই কোটালে জীবন চেনে তিন ভুবনে বিস্তারিত পট।

মরীচিকার লীলায় ভুলে তেপান্তরের অরণ্যে প্রাঙ্গণে
ছুটে চলার অভিজ্ঞতার ক্লান্তি, জ্বালা, দংশন বিষ ভুলে,
এই প্লাবনে অবগাহনে, এই কোটালে ভেসে

এবার বাঁচা তুলকালাম, মর্ত যতই প্রতিকূলের মুখোশ পরে থাক,
বিনাশ তার প্রচণ্ডতার ভল্লে যতই দেখাক লোলুপ তৃষ্ণা!

অমিতাভ গুপ্ত

খনন পর্ব

যেখানে অঙ্গার জ্বলছে
যেখানে মানুষের কালোহাড়
জ্বলছে অঙ্গারে লোহে

যেখানে পাথরের ধাতব
নখের দাগ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে
দেখছি শ্রম কোন মূল্যে

বিকোয়, কার কাছে বিকোলে
মানুষ আরো ভালো অঙ্গার
মানুষ আরো ভালো লৌহ

বাজার জুড়ে ধোয়ামেশিনের
প্রিয়তা, সেখানেই কিভাবে
পৃথিবী পেট চিরে দেখালো

মানুষ কার কাছে বিকোলে
কিভাবে আরো ভালো অঙ্গার
কিভাবে হয়ে ওঠে লৌহ

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একসাথে

খানিকটা ভেঙে দিয়ে এসে যদি তোমার মতো আর একদিক গড়তাম, হয়তো একান্ত নিজের মতো কিছু হতো। কিন্তু আমি সবকিছু নিয়ে এগুতে গিয়ে পিছিয়ে পড়লাম, মাঝপথে দুরবীণ চোখে লাগিয়ে চারিদিক দেখলাম, তোমায় ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। বেশ দেরীতে যখন কাছাকাছি এলাম, দেখলাম—তোমার ঠোঁটে আর সেই মরণ বিজয়ী হাসি নেই ; তোমার আয়ত চোখে বড় ম্রিয়মান নক্ষত্রের ছায়া। আসলে, ভেঙে যেতে পারে, তবে আবার গড়ে দেয় কেউ, মানুষের বাঁচার চর্চা— এক অদ্ভুত বিস্ময়। রাত যত ভেঙে যায়, তোমার আয়ত চোখে তত নক্ষত্রের নতুন বর্ণমালা। প্রতিটি নদীতে এখন একই চাঁদের প্রতিবিম্ব। স্থির বৃক্ষগুলি আমাদের রেখেছে ঘিরে অখণ্ড প্রহরায়।

মনোজ নন্দা

যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে

যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে তার কোনো সহজাত ভীতি নেই,
ভয় নেই, তলিয়ে যাওয়ার অতলে।
যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে তুমি তার হাত ধরো নির্ভয়ে
সে তোমাকে নিয়ে যাবে ফসলের মাঠে।

উঁচু মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে মানুষ সে জানে না—
পায়ের তলায় তার কোনো মাটি নেই;
একরাশ শূন্যতার ওপর দাঁড়িয়ে তার তর্জনী উঠে যায়
আরো শূন্যের ওপরই
কিম্বা নেমে যায় অতল গহ্বরে…

তুমি তার হাত ধরে অন্ধকারে কোন দিকে যাবে?

যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে তুমি তার হাত ধরো নির্ভয়ে
সে তোমাকে জীবন দেখাবে।

অজয় নাগ

এসো পোশাক

এসো পোশাক দুঃখী জনের
বলি আমার কথা মনের
এসো নিশীথ জল মেঘের
ঘুম ভাঙার ম্লান ঘরের
রঙ পাখার খুব ভোরের
তাল নিবিড় গাঢ় বায়ুর
ছিল সেতার সারা দিনের
সব এখন গত আয়ুর

ছেড়ে গিয়েছে ভালো হয়েছে
ফাঁপা স্বজন সুখী প্রাণের
বাঁধ ভেঙেছে আলো জেগেছে
চোখ-দু-দিক-কূল পেয়েছি
লোক-আদির মূল ভ্রাণের
ধূলি ভুবন ঘাট ছুঁয়েছি

অরবিন্দ পাল

অরণ্যে জীবন

এখনও এখানে পড়ে রয়েছে
ধূ ধূ মাঠ সবুজ গাছপালা
আর সহজ সরল মানুষেরা

এখানকার বাতাসে
এখনও রয়েছে মাটির সোদা গন্ধ
আর মমতা জড়ানো ভালবাসা

মাথার ওপরে আকাশ···

এখানে বাতাসে
এখনও খেলা করে
জুঁই ফুলের গন্ধ
শিশুদের কোলাহল

ফিরে এলাম—
এই ভাল অরণ্যে জীবন
সঙ্গী গাছপালা পানাপুকুর
আর ওই সাদা মানুষেরা ।।

শম্ভু বসু

ফ্যাকাশে ধানগাছের মতো

না
এখনো ডাক আসেনি
না আকাশ
না বাতাস
এখনো কেউ ডাকেনি।

ভেবেছিলাম
পাহাড় ডাকবে
সমুদ্র ডাকবে
জঙ্গল ডাকবে।

না
এখনো কোন ডাক আসেনি
ফ্যাকাশে ধান গাছের মতো একই জায়গায়
শিকড় ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি ধূ ধূ মাঠের মধ্যিখানে

জয় গোস্বামী

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে

এসেছি যখন খালি হাতে ফিরবো না
হাতের সামনে যা পাচ্ছি নেবো তাই
একাই নেবো না, ভাইকেও দেবো, ভাই দেবে তার বোনকে
দিয়েছি যখন, ফিরিয়ে নেবো না মনকে

এসেছি যখন, ফিরবো না খালি হাতে
ধুলো ছুঁড়ে দেবো মৃত্যুর গায়ে, স্বামী ছেড়ে-যাওয়া মেয়েটির পায়ে
ও চলে আসুক আমাদের কাছে, আমি আর ভাই বেঁধে দেবো ওর ঘর
এসেছে যখন, আমরা দুজন, দুজনেই ওর বর

পেয়েছি যখন, ফেরাবো না হাত খালি
বাগানকে দেবো সুন্দর মতো মালী
দিনরাত্তির নেশা ক'রে ক'রে যত ছেলেপুলে রাস্তায় ঘোরে
সব ধ'রে ধ'রে বাড়িতে তুলবো
বাড়ি হয়ে যাক খোলা মাঠ আর মাঠ ঘিরে দিক বন
বন-জঙ্গলে আমরা ঘুরবো, প্রতিমুহূর্তে অভূতপূর্ব,
আমরা ঘুরবো আমরা আমরা আমি আমি আমি আমি

আমার সঙ্গে আমিই থাকবো, ওগো অন্তরযামী

মৃদুল দাশগুপ্ত

রান্নাঘর

অবশ ধর্মের বশে। লোকচক্ষু তুচ্ছ করে
শেকড় পুড়িয়ে খাই, ভাগ করি স্ত্রী পুত্রকন্যার
মহামানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ে রান্নাঘরে, একটু কাঠের জন্য
মহাকাশে জঙ্গল বানাই।
আমি কবি, দিগন্ত প্রহরী। একদিন নিঃশ্বাস থামাবো, কিন্তু
ভ্রমণ থামবে না।
যাবো নুন ঝরিয়ে ঝরিয়ে···চতুর্দিকে মূর্তিলোভী, বণিক, বিপ্লবী

অতনু বসু

প্রেমাংশুর লাশ

জল প্রপাতের শব্দে বুকের ফাটল দেখা যায়।
আমি সে নগ্নতা বুঝি, ভেঙে যাই, তবুও হারিনি
এই ভাখো দু'হাতেই রক্ত-স্মৃতি, অথচ আলানী
স্থির রাখি। জড়ো করি শুকনো শিকড়, কাঠ, জল ও বারুদ।
ফেরার খুনীর মতো এসেছি এখানে—
আস্তানা বদল হয়।

শিক-পেরেকের থেকে মনে হয় কাঠ যেন প্রবল আয়ুধ
ফিরে আসবেনা ব'লে চ'লে গেছে যে কঠিন আলো
তবু সে বল্লম হয়ে বিঁধে যেতে এসেছে চিবুকে
পাথর-শিরায় খুঁজি সমগ্র কিশোর কাল, ছায়াশূন্য সাংকেতিক দাগ
ছিন্ন যৌবন নাও, নির্বাসনে আসন পেতেছি।...
এখনো কি ভাঙাচোরা গেরস্তের সজল উঠোনে
অকস্মাৎ উঠে বসে প্রেমাংশুর লাশ?
ভুল স্বপ্নে ভেঙে যায় বাদাড়ের নির্ভুল শাসন
বিবর্ণ হত্যার দৃশ্য একদিকে ডেকে নিয়ে যায়।
কাঁধে ফেলি সরল কুঠার, নির্জন অন্যদিকে খুঁজি
অঙ্গারের লালে মাংস সেঁকে নিতে এসেছে মানুষ
প্রতিবাদহীন ভাঙা চাঁদ এসে লেগে আছে শিয়রের কাছে।

পরিচয় বসু

কবি প্রসবিনী মাতা

জেলের পাঁচিল
ছুঁয়ে ব'সে আছে
এক জননীর কান্না
প্রস্তরীভূত কালচে আকাশ
পরতে পরতে দুলছে
কারা যেন ক্ষ্যাপা বন্যার মতো ফুলছে।
সারা পৃথিবীর সঙ্গমহীন রাত্তিরে আজ ঘুম নেই,
কারো ঘুম নেই;
রাতকানা চোখ ভারি হ'য়ে আসে
ঠায় ব'সে তবু পোড়া চামড়ার মাতা
কালো মানুষের দুঃখে কাঁপছে জেলের বাগানে
বাও বাও-এর পাতা।

আঠাশের সেই সাজোয়ান কালো কবি
জানু পেতে ব'সে যেন লিখে যায়—
শোনো হে মানুষ শোনো
কোনো কবিতাই ব্যর্থ নয় তা জেনো
আজ আরো এক কবিতায় রাত মাগো
নতুন ছন্দে মহাকাব্যের সূচনা পর্ব মাগো
আজ না হলেও কাল স্বাধীনতা আসবেই
সিংহের ঘন হৈ-হুল্লোড়ে জেনো আফ্রিকা ভাসবেই
কবি থাকবে না ট্রাইবাল নাচে সারা রাত্তির জেগে
কবি রয়ে যাবে ফেন্টের ঘাসে অগ্নিকুসুম হয়ে।

প্রেমে-প্রতিশোধে একাকার প্রিয় কবিতার মতো
দাঁড়িয়ে রয়েছে সিল্যুয়েট কালো মানুষ
মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বেরোবে ধিক্কারে ধিক্কারে
আঠাশের সব মরদ কবিরা ছিঁড়বে মাথার চুল
এ গ্রহের যতো দরদী মানুষ সমাধিতে দেবে
তাজা লাইলাক ফুল।

ভালোবাসা, তুমি কত ভালোবাসা দিতে পারো দেখি আজ
প্রেম, তুমি আরো কত প্রেম দিতে রাজি থাকো দেখি আজ।

ভাবতে ভাবতে ফুরিয়ে গিয়েছে কবে
বেদনার নীল খাতা
রাগী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ কবিতা হ'য়ে—
জেলের পাঁচিলে হাত দিয়ে আছে কবি প্রসবিনী মাতা।

মলয় পাত্র

বন্যা

বৃষ্টি এসেছিল, গেছে থেমে।

মা'র কাছে ভাত চেয়ে যে ভিক্ষুক দাঁড়াতো দুয়ারে
সেত জানে, এ অঘ্রাণ
পাকা ফসলের ঘ্রাণে ম' ম' ক'রে উঠবেনা আর,
মিলবে না ভাত ;
বন্যা শুষে নিয়ে গেছে ধানের আঘ্রাণ :
পাকা ধান
ফসলের ঘ্রাণ, মিলবে না আর
মিলবেনা ভাত ;
সে ভিক্ষুক জানে
যা ছিল ভেসেছে সব বানে।

তকতকে হ'য়ে আছে সাজানো গোয়াল
ভেসে গেছে গাই ;
একটা কে ছিল যেন মা'র কোল জুড়ে
গেছে সেও, কোল ফাঁকা তাই।

ভিক্ষুক ফিরেছে পিছু। সেও জানে
বৃষ্টি নেমেছিল, গেছে থেমে ;
জল এসেছিল, গেছে নেমে ;
ঘরে ঘরে বিশ্বাসের মেটে ভিত ন'ড়ে গেছে
যা ছিল টেনেছে সব বানে।